হাত।

৭.৫. ব্যাখ্যা ঃ (ক) লক্ষণা

লক্ষণা কী?

পদ ও পদার্থের (পদের অর্থের) সম্বন্ধকে 'বৃত্তি' বলা হয়। পদ ও পদার্থের সম্বন্ধরূপ বৃত্তি দুই প্রকার—**শক্তি** ও **লক্ষণা**। তাহলে সংকেতরূপ **শক্তির মতো লক্ষণাও পদের** একপ্রকার **বৃত্তি।** এজন্য অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'লক্ষণাপি শব্দবৃত্তিঃ'—'শক্তি'র মতো 'লক্ষণা'ও পদের একপ্রকার বৃত্তি। 'শক্তি' হল পদের সঙ্গে অর্থের (অর্থাৎ পদার্থের) এক প্রকার সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের দ্বারা একটি পদ কেবল মাত্র ঐ পদের অর্থকে জ্ঞাপন করে অথবা একটি অর্থের স্মারক হয়। এজন্য 'শক্তি' প্রসঙ্গে দীপিকাতে বলা হয়েছে, 'অর্থ-স্মৃতি-অনুকূল-পদার্থ-সম্বন্ধঃ শক্তিঃ'। শক্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয় অথবা স্মরণ হয়, সেই অর্থকে বলে শক্য' বা **শক্যার্থ'** (বা মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ)। **শক্যের সম্বন্ধই হল লক্ষণা।** অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'শক্য-সম্বন্ধো লক্ষণা'। শক্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অর্থকেই বলা হয় **'লক্ষণা' বা 'লক্ষ্যার্থ'।**

সম্ভব হয়, তাহলে নানাশক্তি স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। এজাতীয় ক্ষেত্রে নানাশক্তি স্বীকার করলে গৌরব (দোষ) হয়, উপরন্তু লক্ষণাবৃত্তিরও উচ্ছেদ হয়। লক্ষণাবৃত্তি-উচ্ছেদ সমীচীন হতে পারে না, কেননা লাক্ষণিক অর্থ (বা লক্ষ্যার্থ) সর্বসম্মত।

(খ) লক্ষণার প্রকারভেদ

অন্নংভট্ট দীপিকাতে তিন প্রকার লক্ষণার উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) জহৎলক্ষণা, (২) অজহৎলক্ষণা ও (৩) জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা। জহৎ-লক্ষণাকে 'জহৎস্বার্থা লক্ষণা', অজহৎলক্ষণাকে 'অজহৎস্বার্থালক্ষণা' ও জহৎ-অজহৎ-লক্ষণাকে 'জহৎ-অজহৎস্বার্থা-লক্ষণা'ও বলা হয়। দৃষ্টান্তসহ প্রতিটি লক্ষণা ব্যাখ্যা করা গেল।

(১) জহৎলক্ষণা বা জহৎস্বার্থা লক্ষণা

জহৎলক্ষণা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'যত্র বাচ্যার্থস্য অন্বয়াভাবঃ তত্র জহৎলক্ষণা', অর্থাৎ **'যেখানে পদের বাচ্যার্থের (শক্যার্থের) সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত অন্য পদের অন্বয় (মিল) সম্ভব হয় না, সেখানে জহৎলক্ষণা হয়।** দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নংভট্ট 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। এখানে বাক্যের অন্তর্গত 'মঞ্চ' পদে জহৎলক্ষণা হয়েছে। 'মঞ্চ' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ বা শক্যার্থ হল 'মাঁচা' এবং 'ক্রোশন্তি' শব্দের অর্থ 'ক্রোশ প্রদর্শন পূর্বক চীৎকার করা'। 'মঞ্চ' শব্দটির সাক্ষাৎ অর্থ 'মাঁচা' এক প্রাণহীন জড়পদার্থ, যা কখনো চীৎকার করতে পারে না। চীৎকার করা প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব। স্পষ্টতই, বাক্যের অন্তর্গত 'মঞ্চ' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থের সঙ্গে অর্থাৎ বাচ্যার্থের সঙ্গে অপর শব্দ 'চীৎকার'-এর অন্বয় হয় না। কাজেই, 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যটিকে অর্থপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হলে 'মঞ্চ' শব্দটির সাক্ষাৎ অর্থ (বাচ্যার্থ) সম্পূর্ণরূপে **পরিত্যাগ** করে অসাক্ষাৎ অর্থটি গ্রহণ করতে হবে। অসাক্ষাৎ অর্থটি হবে 'মঞ্চে অবস্থিত মানুষ'। তাহলে, বাক্যটির অর্থ হবে, 'মাঁচায় অবস্থিত মানুষ চীৎকার করে', যা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। তাহলে জহৎলক্ষণা প্রসঙ্গে বলা চলে, **যে স্থলে বাক্যস্থ পদসমূহের অন্বয় সাধনের জন্য কোন পদের বাচ্যার্থ (শক্যার্থ)** সম্পূর্ণরূপে **পরিত্যক্ত হয়ে লক্ষ্যার্থ গৃহীত হয়, সেই স্থলে জগৎলক্ষণা হয়।**

(পূর্বে উল্লিখিত) **'গঙ্গায়াং ঘোষ' এই বাক্যেও 'গঙ্গা' পদে জহৎলক্ষণা হয়।** বাক্যটিকে অর্থপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হলে বাক্যস্থ 'গঙ্গা' শব্দের বাচ্যার্থ বা শক্যার্থ যে 'জলপ্রবাহ' তাকে **সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ** করে শব্দটির অসাক্ষাৎ লাক্ষণিক অর্থ 'তীর'কে বুঝতে হয়। এমন ক্ষেত্রে 'গন্ধায়াং ঘোষ'ঃ, এই বাক্যটির অর্থ হয়, 'ঘোষপল্লী গঙ্গা-তীরে অবস্থিত', যা আমাদের সবার কাছে বোধগম্য। এক্ষেত্রেও লক্ষণাটি হল জহৎলক্ষণা, কেননা বাক্যটিকে অর্থপূর্ণ করার জন্য 'গঙ্গা' শব্দের বাচ্যার্থকে (জলপ্রবাহকে) সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে লক্ষ্যার্থকে গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) অজহৎলক্ষণা বা অজহৎ-স্বার্থা-লক্ষণা

অজহৎ লক্ষণা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'বাচ্যার্থস্য অপি অন্বয়ঃ, তত্র অজহৎ ইতি', অর্থাৎ 'যেখানে পদের বাচ্যার্থের (শক্যার্থের) সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত অন্য পদের অন্বয় (মিল) সম্ভব হয়, সেখানে অজহৎলক্ষণা হয়। অন্যভাবে বলা চলে, **'যে স্থলে পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ, উভয়বিধ অর্থ গৃহীত হয়, সেস্থলে অজহৎলক্ষণা হয়।'** এক্ষেত্রে শব্দের বাচ্যার্থ

বা শক্যার্থ পরিত্যক্ত না হয়ে লক্ষণা হয়, অর্থাৎ অসাক্ষাৎ লাক্ষণিক অর্থটি সাক্ষাৎ অর্থকে পরিত্যাগ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নংভট্ট 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। 'ছত্রিণো' অর্থে 'ছত্রধারী ব্যক্তি', 'গচ্ছন্তি' অর্থে 'গমন করা' বা 'যাওয়া'। দূর থেকে কোন ব্যক্তি একদল রথ-বাহিত-ছত্রী, গজবাহি, অশ্বারোহী, পদাতিক সেনাকে যেতে দেখে যখন বলেন, 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' তখন বাক্যস্থ 'ছত্রি' পদে অজহৎলক্ষণা হয়। এখানে 'ছত্রি' শব্দের দ্বারা কেবল বাচ্যার্থ 'ছত্রধারী' বোধিত হলে বাক্যের অন্তর্গত 'গচ্ছন্তি' শব্দটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না, কেননা 'যাওয়া' ক্রিয়ার সঙ্গে রথবাহিত ছত্রিগণই কেবল যুক্ত নয়, গজবাহিত, অশ্ববাহিত, পদাতিক সেনাগণও যুক্ত। কাজেই, 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' বাক্যটির অর্থকে আংশিকভাবে প্রকাশ না করে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হলে 'ছত্রি' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ (শক্যার্থ) 'ছত্রকারী' এবং **ছত্রীদের সান্নিধ্যবশত** অসাক্ষাৎ অর্থ (লক্ষ্যার্থ) 'অছত্রধারী' (অশ্বারোহী ইত্যাদি)—উভয়কেই গ্রহণ করতে হবে। 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' বাক্যটির অর্থ হল, 'একদল সেনা যুদ্ধে যায় যাদের কিছু রথবাহিত ছত্রধারী, সবাই নয়।' কাজেই 'ছত্রি' অর্থে, 'ছত্রি-পদাতি-গজ-তুরগাদি ঘটিত এক সমুদায়' অর্থাৎ ছত্রি ও অছত্রি—ছত্রধারী এবং ছত্রহীন উভয়কেই বোঝায়। 'যাওয়া ক্রিয়াটি' (গচ্ছন্তি) ছত্রধারী ও ছত্রহীন উভয়ের দ্বারা সংঘটিত হওয়ায় এখানে 'ছত্রি' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ শক্যার্থ এবং অসাক্ষাৎ লক্ষ্যার্থ—উভয় অর্থকেই গ্রহণ করতে হয় বলে 'ছত্রি' শব্দে অজহৎলক্ষণা হয়।

(৩) জহৎ-অজহৎ লক্ষণা বা জহৎ-অজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা

জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'যত্র বাচ্যৈক-দেশ-ত্যাগেন একদেশান্বয়ঃ, তত্র জহদজহদিতী', অর্থাৎ যেখানে **এক বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের সঙ্গে অন্য বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের অন্বয় (মিল) সম্ভব না হওয়ায় বাচ্যার্থ দুটির এক অংশ গ্রহণ ও অন্য অংশ বর্জন করতে হয়, সেখানে জহৎ-অজহৎ লক্ষণা হয়'**। অন্য ভাবে বলা যায়, 'যে লক্ষণাতে বাচ্যার্থের (শক্যার্থের) এক অংশ পরিত্যাগ করে অন্য অংশ গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে জহৎ-অজহৎ লক্ষণা'। দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নংভট্ট উপনিষদের 'তৎ-ত্বম্-অসি (তত্ত্বমসি) বাক্যটি উল্লেখ ক'রে, নৈয়ায়িক হয়েও, অদ্বৈতসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'তত্ত্বমসি', উপনিষদের এই মহাবাক্যটির অর্থ হল, 'তুমি হও সেই'। 'তৎ' অর্থে 'তুমি' অর্থাৎ 'জীবচৈতন্য' বা 'জীবাত্মা', আর 'ত্বম্' অর্থে 'সেই' অর্থাৎ 'পরমচৈতন্য' বা 'পরমাত্মা'। 'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যটিতে জীবাত্মা (তৎ) ও পরমাত্মাকে (ত্বম) অভিন্ন বলা হয়েছে, কেননা 'তুমিই সেই' কথাটির এখানে অর্থ হল 'জীবাত্মাই পরমাত্মা", 'জীবচৈতন্যই পরমচৈতন্য'। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার, খণ্ডচৈতন্য ও অখণ্ডচৈতন্যের, অল্পজ্ঞতা ও সর্বজ্ঞতার—এমন দুটি বিরুদ্ধ বিষয়ের অভেদ হতে পারে না, যেমন 'নীলঘট ও পীতঘট বিরুদ্ধ হওয়ায় তাদের অভেদ হতে পারে না।

'তত্ত্বমসি' উপনিষদের এই বাক্যটিকে বোধগম্য করার জন্য অদ্বৈত পণ্ডিতগণ বাক্যস্থ শব্দদুটি থেকে—'জীবাত্মা' (তৎ) ও 'পরমাত্মা' (ত্বম্) এই শব্দ দুটি থেকে—'জীব' ও 'পরম' এই বিশেষণ দুটি পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট অংশের, 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' এই অংশের অর্থ গ্রহণ করেছেন। বিশেষণ-বিরহিত শব্দ দুটি চৈতন্যমাত্রকে (বা শুদ্ধ আত্মাকে) বোধিত করে। যেমন,

(জীবচৈতন্য—জীব = চৈতন্য), তেমনি (পরমচৈতন্য—পরম = চৈতন্য)। এভাবে, শব্দদুটির সাক্ষাৎ অর্থের এক অংশ পরিত্যাগ করে এবং অন্য অংশ গ্রহণ করে তৎ এবং ত্বম্-এর মধ্যে অভেদ কল্পনা ক'রে বলা চলে, 'তৎ-ত্বম্-আসি'। অন্নংভট্টের মতে, বাক্যটির এপ্রকার অর্থবোধের ক্ষেত্রে 'তৎ' এবং 'ত্বম্' শব্দে জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, অন্নংভট্ট 'তত্ত্বমসি' বাক্যটিকে জহৎ-অজহৎ লক্ষণার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করলেও **ব্যাখ্যাটি অদ্বৈতবেদান্তসম্মত হওয়ায় অনেক নৈয়ায়িক এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না এবং তাঁরা উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্যটিকেও জহৎ-অজহৎ লক্ষণার দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করেন না। নৈয়ায়িকগণ জহৎ-অজহৎ লক্ষণার দৃষ্টান্তরূপে 'সোঽয়ং দেবদত্ত', 'এই সেই দেবদত্ত', এই বাক্যটির উল্লেখ করেন।** দেবদত্ত নামক ব্যক্তিকে পূর্বে কাঞ্চিতে দেখে পরে কাশীতে দেখলে আমাদের এমন বোধ হয় যে, বর্তমানদৃষ্ট ব্যক্তিই হল পূর্বদৃষ্ট ব্যক্তি। এরূপ বোধকে বলা হয় 'প্রত্যভিজ্ঞা'। এখানে 'সেই' শব্দের দ্বারা কাঞ্চিতে দেখা দেবদত্তের স্মরণাত্মক জ্ঞান এবং 'এই' শব্দের দ্বারা বর্তমানে দৃষ্ট দেবদত্তের প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান বোধিত হয়। বাক্যটিতে পূর্বাপর এ-দুটি জ্ঞানকে অভেদরূপে গণ্য করা হয়েছে ; কিন্তু কাঞ্চিতে দেখা দেবদত্তের সঙ্গে বর্তমান-দৃষ্ট দেবদত্তের অভেদ সম্ভব নয়, কেননা দুটি প্রত্যক্ষের পরিবেশ-স্থান-কালাদি—অভিন্ন নয়, তারা ভিন্ন ভিন্ন। বাক্যটিকে বোধগম্য করতে হলে বাক্যস্থ শব্দদুটি থেকে—'কাঞ্চিস্থ দেবদত্ত' এবং 'কাশীস্থ দেবদত্ত', এই শব্দ দুটি থেকে—'কাঞ্চিস্থ' এবং 'কাশীস্থ' এই বিশেষণ দুটি পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট অংশের, 'দেবদত্ত' অংশের অর্থ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষণ-বিরহিত শব্দ দুটি কেবলমাত্র দেবদত্তকে বোধিত করে। যেমন, 'কাঞ্চিস্থ দেবদত্ত—কাঞ্চিস্থ = দেবদত্ত ; তেমনি কাশীস্থ দেবদত্ত—কাশীস্থ = দেবদত্ত। এভাবে, শব্দদুটির সাক্ষাৎ অর্থের এক অংশ পরিত্যাগ করে এবং অন্য অংশ গ্রহণ করে 'এই' এবং 'সেই'-এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করে বলা চলে, 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ', 'এই সেই দেবদত্ত'। ন্যায় মতে, বাক্যটির এইপ্রকারে অর্থবোধের ক্ষেত্রে 'এই' এবং 'সেই' শব্দে জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা হয়।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, সকল নৈয়ায়িক জহৎ-অজহৎ লক্ষণা স্বীকার করেন না। এঁদের মতে, লক্ষণা দুপ্রকার—জহৎলক্ষণা বা জহৎ-স্বার্থা লক্ষণা এবং অজহৎ লক্ষণা বা অজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা।